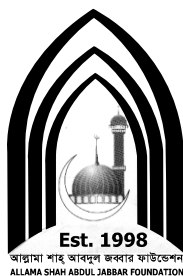


# ইমাম আবু হানিফা : জীবন ও কর্ম

# ইমাম আবু হানিফা জীবন ও কর্ম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী



আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন

---

## ইমাম আবু হানিফা রাহমতুল্লাহি আলাইহি: জীবন ও কর্ম

মুহাম্মদ আবদুল হাই নদভী

---

পরিবেশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার রিসার্চ একাডেমির পক্ষে  
মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহীদ আল-আমীন (হাসনাত), ধনিয়ালাপাড়া, চট্টগ্রাম

---

প্রকাশক: আল্লামা শাহ আবদুল জব্বার ফাউন্ডেশন  
বায়তুশ শরফ জিলানী মার্কেট, চট্টগ্রাম-৪১০০

---

প্রকাশকাল: জুলাই ২০১১, রজব ১৪৩৩, আষাঢ় ১৪১৮

---

প্রকাশনা ক্রমিক: ৭০, বিষয় ক্রমিক: ০১

---

© প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

---

আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুন  
নিউ মোস্তফা লাইব্রেরী, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম  
মুহাম্মদী লাইব্রেরী, প্রধান সড়ক, কক্সবাজার  
হাসান লাইব্রেরী, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলা  
মোস্তফা লাইব্রেরী, কেরানী হাট, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম  
ছাত্রবন্ধু লাইব্রেরী, মোস্তাফিজুর রহমান মার্কেট, আমিরাবাদ, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম  
বায়তুশ শরফ লাইব্রেরী, তেজগাঁও থানার সামনে, ফার্মগেইট, ঢাকা

---

শব্দবিন্যাস: মু. সগির আহমদ চৌধুরী, ০১৮১৯-৩৫৩৮৯৬,

mujahid\_sach@yahoo.com

---

প্রচ্ছদ ও মুদ্রণ: সাইলেন্স, সিরাজদৌলা রোড, চট্টগ্রাম

---

মূল্য : ৫০ [পঞ্চাশ] টাকা মাত্র

---

**Imam Azam Abu Haneefa (Rh.): Jiban O Kormo:** By: Mohammad  
Abdul Hai Nadvi, Published By: Allamah Shah Abdul Jabbar  
Foundation, Baitus Sharaf, Chittagong-4100, Bangladesh, Price: 50

e-mail: [abdulhai.nadvi@yahoo.com](mailto:abdulhai.nadvi@yahoo.com)

[saajctg@yahoo.com](mailto:saajctg@yahoo.com)

[www.saajbd.org](http://www.saajbd.org)

## সূচিপত্র

জীবন ও কর্ম	০৫
জন্ম ও বংশ	০৫
প্রিয় নবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎবাণী	০৭
ছাত্রবৃন্দ	১১
ইমাম আযম ﷺ-এর বুদ্ধিমত্তা	১১
স্বভাব-চরিত্র	১৫
ইবাদত ও রিয়াযত	১৮
রচনাবলি	২০
ইমাম আযম ﷺ ও ইলমে ফিকহ	২১
হানাফী মায়হাব দেশে দেশে	২৯
নবীপ্রেম ও ইমাম আবু হানীফা ﷺ	৩০
ইমাম আবু হানীফা ﷺ-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলি	৩০
ওফাত	৩১

## জীবন ও কর্ম

ইমাম আযম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি বিশ্বের এক অবিস্মরণীয় ও সম্মানিত নাম। তিনি ছিলেন একাধারে ফকীহ ও মুজতাহিদদের ইমাম, বিজ্ঞ হাদীসবেত্তাদের সম্মানিত উস্তাদ ও সূফীয়ায়ে কেরামের পথপ্রদর্শক। বস্তুত নুবুয়ত ও সাহাবিয়াতের মহান মর্যাদাদ্বয়ের পর একজন মানুষের মধ্যে যতো প্রকার মহৎ গুণাবলি হতে পারে তিনি সেই সবার প্রকৃত ধারক ও বাহক ছিলেন।

ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি ইসলামী ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে যেসব মৌলিক নীতিমালা (উসূল) প্রণয়ন করেছেন তা উম্মতে মুহাম্মদীর বেশি সংখ্যক লোক মেনে নিয়েছেন। আর ফিকহী হানাফীর অনুসারী (মুকাল্লিদ) হওয়াকে নিজেদের জন্য গৌরব মনে করেন। অগণিত মুফাস্সির, মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও সূফী-দরবেশ তাঁর মাযহাবের অনুসারী। অনেক মুহাদ্দিস ও দার্শনিক তাঁর উসূল (নীতিমালা)-এর ভিত্তিতে ইসলামী আইনের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেছেন। বর্তমান বিশ্বে দুই তৃতীয়াংশের বেশি মুসলমান ফিকহী হানাফী মোতাবেক নিজেদের পারিবারিক, সামাজিক ও ইবাদত-বন্দেগিতে নিয়োজিত।

## জন্ম ও বংশ

ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর বংশ নিয়ে ইতিহাসবিদদের মতে মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তারীখে বাগদাদ গ্রন্থে আহমদ ইবনে আলী ইবনে সাবিত আল-খতীবুল বগদাদী (৩৯২-৪৬৩ হি. = ১০০২-১০৭২ খ্রি.) রাহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর সম্পর্কিত সকল বর্ণনা একত্রিত করেন আর বিরুদ্ধবাদীদের সমস্ত অপবাদ খণ্ডন করার প্রয়াস পান। অনেক ইতিহাসবিদের ধারণা যে, ইমাম সাহেব রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর দাদা ‘যুতী’ গোলাম ছিলেন। অথচ খতীবে বাগদাদী ইমাম সাহেব রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর প্রপৌত্র ইসমাজিল ইবনে হাম্মাদ ইবনে আবু হানীফা থেকে বিশ্বস্ত সূত্রে বর্ণনা করেন যে, ইমাম সাহেব রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর

দাদা ‘যূতী’ আদৌ গোলাম ছিলেন না। তিনি তাঁর বর্ণনায় এটা বিশেষভাবে বলেছেন যে, ‘আমরা গোলাম নই এবং কখনো গোলাম ছিলাম না।’<sup>১</sup> খতীব বাগাদাদী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর এসব বর্ণনা পরবর্তী গবেষকরা মেনে নিয়েছেন।<sup>২</sup>

‘যূতী’ সম্পর্কে এটা সঠিকভাবে জানা যায়নি যে, তিনি কোন শহরের বাসিন্দা ছিলেন। তবে ধারণা করা হয় যে, তিনি পারস্য অঞ্চলের কোন এক শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এ যুগে এ অঞ্চলে ইসলামের প্রভাব পড়লে অনেক সম্ভ্রান্ত গোত্র ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের ফলে তাঁর গোত্রের সমস্ত লোক তাঁর বিরোধী হয়ে উঠলে তিনি পারস্য ত্যাগ করে কুফায় হিজরত করেন। এ সময় কুফা ছিল ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী এবং হযরত আলী রহমতুল্লাহু আলায়হি ছিলেন মুসলিম বিশ্বের খলীফা। একদিন ‘যূতী’ আমীরুল মুমিনীনের খিদমতে মুহাব্বতের নিদর্শনস্বরূপ ফালুদা নিয়ে উপস্থিত হন, যা খলীফা বেশ পছন্দ করতেন। ইমাম সাহেবের পিতা ‘সাবিত’ রহমতুল্লাহু আলায়হি কুফায় জন্মগ্রহণ করলে, ‘যূতী’ শিশুকে হযরত আলী রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর খিদমতে নিয়ে যান। তিনি সস্নেহে শিশুর কল্যাণের জন্য দুআ করেন। যেন কিয়ামত পর্যন্ত এই গোত্রের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে।<sup>৩</sup>

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর জন্ম তারিখ নিয়ে কয়েকটি মত দেখা যায়। যথা- ৬০ হি. = ৬৭৯ খ্রি., ৬১ হি. = ৬৮০ খ্রি., ৭০ হি. = ৬৮৯ খ্রি.। তবে অধিকাংশের মতে তিনি ৮০ হিজরী ৬৯৯ খ্রিস্টাব্দে উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান (২৬-৮৬ হি. = ৬৪৬-৭০৫ খ্রি.)-এর শাসনামলে জন্মগ্রহণ করেন।

আধুনিক লেখকদের মধ্যে আল্লামা মুহাম্মদ যাহিদ আল-কাওসারী (১২৯২-১৩৭১ হি. = ১৮৭৯-১৯৫২ খ্রি.) বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর জন্মতারিখ ৭০ হি. = ৬৮৯ খ্রি. সালকে প্রাধান্য দেন।<sup>৪</sup>

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর প্রকৃত নাম ‘নুমান’ আর কুনিয়াত (উপনাম) আবু হানীফা। আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর অর্থ হলো সমস্ত বাতিল ধর্ম ও মতবাদ থেকে বিমুক্ত হয়ে সঠিক দীন বা ধর্ম গ্রহণকারী সেই অর্থে এ

<sup>১</sup> খতীব বাগাদাদী, *তারীখু বগদাদ*, দারুল কুতুব আল-ইলমিয়া, বয়রুত, লেবনান (১৪১৭ হি. = ১৯৯৬ খ্রি.), খ. ১৩, পৃ. ৩২৬, জীবনী : ৭২৪৯

<sup>২</sup> ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *তাহযীবুত তাহযীব*, মাতবাতু দায়িরাতিন নিযামিয়া, হায়দরাবাদ, ভারত (১৩২৪ হি. = ১৯০৮ খ্রি.), খ. ১০, পৃ. ৪৪৯, জীবনী : ৮১৭

<sup>৩</sup> ইবনে হাজর আল-আসকলানী, *প্রাণ্ডুত*, খ. ১০, পৃ. ৪৪৯, জীবনী : ৮১৭

<sup>৪</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ, খ. ২, পৃ.

কুনিয়াত গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর নুমান নামের রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লামা আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে হাজর আল-মক্কী আল-হায়তামী رحمتهما اللہ (৯০৯-৯৭৪ হি. = ১৫০৪-১৫৬৭ খ্রি.) বলেন, নুমান অভিধানে এমন রক্তকে বলে যা দ্বারা শরীরের সমস্ত পাজর অটুট থাকে এবং যা দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গ সতেজ থাকে। আর তেমনি ইমাম আযম رحمتهما اللہ-এর পবিত্র ব্যক্তিত্ব ইসলামের মেরুদণ্ড এবং ইবাদত ও মুআমিলাত (সামাজিক রীতি-নীতি)-এর সমস্ত বিধি-বিধানের জন্য আত্মাস্বরূপ। ‘নুমান’-এর দ্বিতীয় অর্থ হলো, লাল ও সুগন্ধময় ঘাস। যেহেতু তাঁর সুচিন্তিত ইজতিহাদ ও গবেষণায় ফিকহে ইসলামী (ইসলামী আইনশাস্ত্র) বিশ্বের চতুর্দিকে সুগন্ধির মতো ছড়িয়ে পড়ে।<sup>১</sup>

### প্রিয় নবী ﷺ-এর ভবিষ্যৎবাণী

ইমাম আযম رحمتهما اللہ-এর জন্মের বহু বছর পূর্বে তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে হযুর عليه السلام-এর সুসংবাদ পাওয়া যায়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَأَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْجُمُعَةِ: ﴿وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ ۝﴾ [الجمعة] قَالَ: قُلْتُ: مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَلَمْ يُرَاجِعْهُ حَتَّى سَأَلَ ثَلَاثًا، وَفِينَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيُّ، وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ كَانَ الْإِيمَانُ عِنْدَ الثُّرَيَّا، لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِنْ هَؤُلَاءِ».

‘হযরত আবু হুরায়রা رضي الله عنه থেকে বর্ণিত, আমরা হযুর ﷺ-এর দরবারে উপস্থিত ছিলাম এ সময় সূরা জুমুআ অবতীর্ণ হলো। যখন হযুর ﷺ ‘এই রাসূল প্রেরিত হয়েছেন অন্য আরও লোকদের জন্য, যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি।’<sup>২</sup> আয়াতখানা তিলাওয়াত করলেন, তখন উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে কেউ জিজ্ঞাসা করলেন, হযুর! এ অন্যান্যরা কারা, যারা এখনও আমাদের সাথে মিলিত হয়নি? হযুর ﷺ উত্তরদানে নিরবতা পালন করলেন। যখন বারবার এ প্রশ্ন করা হয় তখন হযুর ﷺ

<sup>১</sup> ইবনে হাজর আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৪৮

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-জুমুআ, ৬২:৩

হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)-এর কাঁধে তাঁর পবিত্র হাত মুবারক রেখে ইরশাদ করলেন, ‘যদি ঈমান (দীন) সুরাইরা নক্ষত্রের নিকটেও অবিস্তৃত হয় তবে এ সম্প্রদায়ের লোকেরা তা অবশ্যই হস্তগত করে নেবে।’<sup>১</sup>

আল্লামা ইবনে হাজর আল-মক্কী আল-হায়তামী (রাঃ) হাফিযুল হাদীস ইমাম জালাল উদ্দীন আবদুর রহমান ইবনে আবু বকর ইবনে মুহাম্মদ আস-সুয়ুতী (রাঃ) (৮৪৯-৯১১ হি. = ১৪৪৫-১৫০৫ খ্রি.)-এর ছাত্রদের বরাতে লিখেছেন যে, আমাদের উস্তাদ (সুয়ুতী) দৃঢ়তার সাথে বলতেন যে, এ হাদীস দ্বারা ইমাম আযম (রাঃ)-এর দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ ইমাম আযম (রাঃ)-এর যুগে পারস্যবাসীদের কেউই তাঁর ইল্মী (জ্ঞানের) যোগ্যতার ধারে কাছে যেতে পারেনি। বরং তাঁর মর্যাদা ও গৌরবের বিষয় তো স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু তাঁর ছাত্রদের সমতুল্য যোগ্যতাও কেউ অর্জন করতে পারেনি।<sup>২</sup>

ইমাম আযম (রাঃ) হুযুর (রাঃ)-এর উক্ত গৌরাবান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য আরেফে কামেল হযরত দাতা গঞ্জবখশ আলী ইবনে ওসমান ইবনে আবু আলী আল-জালালী আল-হাজওয়ীরী (রাঃ) (১০০০-৪৬৫ হি. = ১০৭২ খ্রি.)-বর্ণিত ঘটনা থেকে বোঝা যায়। তিনি ইরশাদ করেন,

وَيَحْيَىٰ بْنُ مَعَاذٍ الرَّازِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَوَيْدٍ: يَتَغَيَّرُ عَلَيْهِ رَأْيُهُ خَوَابٍ دِيدِمٍ، كَقَتْمَشٍ: «أَيُّنَ

أَطْلَبُكَ؟» قَالَ: «عِنْدَ عِلْمِ أَبِي حَنِيفَةَ».

‘হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুআয আর-রাযী (রাঃ) বলেন যে, আমি একদিন হুযুর (রাঃ)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তখন আমি আরয করলাম, হুযুর! আপনাকে আমি কোথায় তালাশ করবো? ইরশাদ করেন, ‘আবু হানীফার জ্ঞান সমুদ্রে তালাশ করো।’<sup>৩</sup>

## শিক্ষা ও অধ্যাপনা

ইমাম আযম প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করার পর পৈত্রিক ব্যবসার প্রতি মনোনিবেশ করলেন। যেহেতু তিনি ব্যবসায়ী

<sup>১</sup> আল-বুখারী, আস-সহীহ দারু তুকিন নাজাত, বয়রুত, লেবনান (প্রথম সংস্করণ: ১৪২২ হি. = ২০০১ খ্রি.), খ. ৬, পৃ. ১৫১, হাদীস: ৪৮৯৭

<sup>২</sup> ইবনে হাজর আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৫৯০

<sup>৩</sup> আলী আল-হাজওয়ীরী, কাশফুল মাহজুব, পৃ. ২২৪



পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তবে যে কাজের জন্য আল্লাহ তাআলা তাঁকে সৃষ্টি করেছেন এর নিদর্শন তাঁর উজ্জ্বল চেহারায ফুটে উঠতো। তাঁর উচ্চ শিক্ষা অর্জনের পেছনে একটি চমৎকার ঘটনার বিবরণ পাওয়া যায়।

একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ কুফার প্রখ্যাত ইমাম আল্লামা আমির ইবনে শুরাহবীল আশ-শাবী রহমতুল্লাহু আলায়হ (১৯-১০৩ হি. = ৬৪০-৭২১ খ্রি.)-এর বাড়ির নিকট দিয়ে বাজারে যাচ্ছিলেন, পথিমধ্যে ইমাম শাবী রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। তিনি তাঁর চেহারায সৌভাগ্যের নিদর্শন চমকতে দেখলে কাছে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ বললেন, বাজারে যাচ্ছি। এতে ইমাম শাবী রহমতুল্লাহু আলায়হ বললেন, তুমি কি কারো নিকট শিক্ষাগ্রহণ করো? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ না-বাচক উত্তর দিলেন। তখন ইমাম শাবী রহমতুল্লাহু আলায়হ বললেন, আমি তোমার ইলম হাসিলের যোগ্যতা লক্ষ করছি। তুমি ওলামাদের সাহচর্য গ্রহণ কর। এ উপদেশ ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর অন্তরে রেখাপাত করল। তাই তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব-সহকারে ইলম হাসিলের প্রতি মনোনিবেশ করেন।<sup>১</sup>

তিনি প্রথমে ইলমে কলাম তথা আকায়িদ শাস্ত্রের জ্ঞান অর্জন করেন। এ শাস্ত্রে গভীর প্রজ্ঞা ও পাণ্ডিত্য অর্জনের পর আল্লাহদ্রোহী ইসলামবিদ্বেষী তাগুতি অপশক্তির স্বরূপ উন্মোচন করে তাদের অপতৎপরতা কঠোরভাবে দমন করেন এবং ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল পতাকাকে সমুন্নত করেন। কিছুকাল পর তাঁর অন্তরে এ ধারণার উদ্বেক হলো যে, দীন সম্পর্কে সাহাবায়ে কেরাম রহিমতুল্লাহু আনহুম থেকে অধিক জ্ঞানী কে হতে পারে? তা সত্ত্বেও এ পুত-পবিত্র আত্মার অধিকারী ব্যক্তিগণ জবরিয়া, কদরিয়া প্রভৃতি বাতিল দল-উপদলের দোদাঁড় প্রতাপের প্রাক্কালে শুধু তাঁদের বিরোধিতায় দায়িত্বকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং তাদের চিন্তাধারায় বেশিরভাগ কুরআন, সুন্নাহ ও ফিকহের মাসায়িলের দিকে ছিল সবচেয়ে বেশি। এরপর থেকেই ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ এসব বিষয় থেকে বিমুখ হয়ে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইলমে ফিকহের গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। এ উদ্দেশ্যে তিনি তৎকালীন কুফার খ্যাতনামা ফকীহ ও ইসলামী আইনবিদ হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলাইমান (০০০-১২০ হি. = ০০০-৭৩৭ খ্রি.)-এর শিক্ষাকেন্দ্রে নিয়মিত যোগদান করেন।<sup>২</sup>

গবেষকগণ ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর উস্তাদদের মধ্যে প্রসঙ্গি ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের এক দীর্ঘ তালিকা উল্লেখ করেছেন। আল্লামা ইবনে হাজার

<sup>১</sup> ইবনে হাজার আল-হায়তামী, *আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান*, পৃ. ৫৯০

<sup>২</sup> ইবনে হাজার আল-হায়তামী, *আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান*, পৃ. ৫৯০

আল-মককী আল-হায়তামী আবু হাশিম আল-আলায়হি তাঁর আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান গ্রন্থে আবু আবদুল্লাহ ইবনে হাফসের সূত্রে তাঁর চার হাজার উস্তাদের নাম উল্লেখ করেন।<sup>১</sup>

মূলত ইমাম আযম আবু হাশিম আল-আলায়হি ছিলেন একজন তাবিঈ।<sup>২</sup>

ইবনে সাদ আবু হাশিম আল-আলায়হি (১৬৮-২৩০ হি. = ৭৮৪-৮৪৫ খ্রি.) তাঁকে তাবিঈদের পঞ্চম স্তরের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক ইবনুন নায়র আল-আনসারী আবু হাশিম আল-আলায়হি (১০ হি. পূর্ব-৯৩ হি. = ৬১২-৭১২ খ্রি.)-কে দেখেছেন এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা আলকমা ইবনে খালিদ আল-আসলমী আবু হাশিম আল-আলায়হি (০০০-৮৭ হি. = ০০০-৭০৬ খ্রি.), হযরত সাহল ইবনে সাদ আল-আনসারী আবু হাশিম আল-আলায়হি (০০০-৯১ হি. = ০০০-৭১০ খ্রি.) ও হযরত আবুত তুফায়েল আমির ইবনে ওয়াসিলা ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর আল-কুরায়শী আবু হাশিম আল-আলায়হি (০৩- ১০০ হি. = ৬২৫-৭১৮ খ্রি.) প্রমুখ সাহাবীদের সমসায়িক ছিলেন এবং তাঁদের অনেকের সাক্ষাৎ লাভ করেন।<sup>৩</sup>

ইমাম আযম আবু হাশিম আল-আলায়হি-এর উস্তাদের তালিকায় সাতজন সাহাবী এবং তিরানব্বইজন প্রসঙ্গি তাবেঈ রয়েছে। সাহাবীদের মধ্যে হযরত আনাস ইবনে মালিক আল-আনসারী আবু হাশিম আল-আলায়হি ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আওফা আল-আসলমী আবু হাশিম আল-আলায়হি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাবেঈদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন: হযরত যায়দ ইবনে আলী ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আবু হাশিম আল-আলায়হি (৭৯-১২২ হি. = ৬৯৮-৭৪০ খ্রি.), হযরত মুহাম্মদ ইবনে আলী ইবনে যয়নুল আবিদীন ইবনুল হুসাইন ইবনে আলী আল-বাকির আবু হাশিম আল-আলায়হি (৫৮-১১৪ হি. = ৬৭৬-৭৩২ খ্রি.), হযরত জাফর ইবনে মুহাম্মদ আল-বাকির আলী ইবনে যয়নুল আবেদীন ইবনুল হুসাইন আস-সাদিক আবু হাশিম আল-আলায়হি (৮০-১৪৮ হি. = ৬৯৯-৭৬৫ খ্রি.), হযরত আবদুল্লাহ ইবনুল হাসান ইবনুল হাসান ইবনে আলী ইবনে আবু তালিব আবু হাশিম আল-আলায়হি (৭০-১৪৫ হি. = ৬৯০-৬৬২ খ্রি.), হযরত আতা ইবনে আবু রাবাহ আসলম ইবনে সাফওয়ান আবু হাশিম আল-আলায়হি (২৭-১১৪ হি. = ৬৪৭-৭৩২ খ্রি.), হযরত হিশাম ইবনে উরওয়া ইবনু যুবার ইবনুল আওয়াম আল-আসদী আবু হাশিম আল-আলায়হি (৬১-১৪৬ হি. = ৬৮০-৭৬৩ খ্রি.), হযরত নাকি ইবনে জুবার

<sup>১</sup> ইবনে হাজর আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৫৯০

<sup>২</sup> ইবনে নাদীম, পৃ. ১০১

<sup>৩</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

ইবনে মুতইম রহমতুল্লাহি আলায়হি (০০০-৯৯ হি. = ০০০-৭১৭ খ্রি.), হযরত ইকরামা ইবনে আবদুল্লাহ আল-মাদানী রহমতুল্লাহি আলায়হি (২৫-১০৫ হি. = ৬৪৫-৭২৩ খ্রি.) এবং হযরত আমর ইবনে শুরাহওয়ীল আল-হামদানী রহমতুল্লাহি আলায়হি (০০০-৬৩ হি. = ০০০-৬৮২ খ্রি.) প্রমুখ।<sup>১</sup>

তবে ফিকাহশাফ্বে তাঁর প্রধান শিক্ষক হলেন হযরত হাম্মাদ ইবনে আবু সুলায়মান রহমতুল্লাহি আলায়হি। ইমাম হাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর ছাত্রদের মধ্যে হিফয ও মেধা শক্তির দিক দিয়ে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মতো কেউ ছিল না বিধায় ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি তাঁর শিক্ষক হাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি ও সহপাঠী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হন। হযরত হাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর ইন্তিকালের পর সকলে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। এক বছরকাল তিনি তাঁর শিক্ষক হযরত হাম্মাদ রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর শিক্ষালয়ে অধ্যাপনা করেন এবং সমসায়িক যুগে ইসলামী আইনশাস্ত্রের অনন্য সাধারণ ইমাম ও ব্যক্তিরূপে পরিচিত হন।<sup>২</sup>

## ছাত্রবৃন্দ

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর ছাত্র সংখ্যাও গণণাতীত। ইসলামী শরীয়তের ইমামদের মধ্যে তাঁর সমতুল্য ছাত্রসংখ্যা এবং তাঁর ছাত্রদের সমপর্যায়ের ছাত্র কারো মধ্যে দেখা যায় না। ইমাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইবরাহীম ইবনে হাবীব আল-আনসারী রহমতুল্লাহি আলায়হি (১১৩-১৮২ হি. = ৭৩১-৭৯৮), ইমাম যুফার ইবনুল হুযায়ল আল-আনবারী রহমতুল্লাহি আলায়হি (১১০-১৫৮ হি. = ৭২৮-৭৭৫ খ্রি.) ও ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান ইবনে ফরকদ আশ-শায়বানী (১৩১-১৮৯ হি. = ৭৪৮-৮০৪ খ্রি.), ইমাম হাসান ইবনে যিয়াদ আল-লুলুওয়া রহমতুল্লাহি আলায়হি (০০০-২০৪ হি. = ০০০-৮১৯ খ্রি.) প্রমুখ তাঁর সেসব কৃতিত্বপূর্ণ সুযোগ্য ছাত্রদের অন্তর্ভুক্ত, যারা অসীম ত্যাগ ও কর্মের মাধ্যমে হানাফী ফিকাহকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছেন।

## ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর বুদ্ধিমত্তা

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি অত্যন্ত মেধাবী ও বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন। যে কোন জটিল ও কঠিন বিষয়কে তিনি খুব সহজভাবে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। কুরআন, হাদীস ও যুক্তির কষ্টিপাথরে তিনি এমনই সমাধান

<sup>১</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

<sup>২</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৫৯

প্রদান করতেন যে, যার পর আর কোনো কথা বলার অবকাশ থাকতো না। এ ব্যাপারে ফিকহী হানাফীর প্রতিটি উসূল ও মাসআলা তো উজ্জ্বল প্রমাণ বহন করে। তা ছাড়া তাঁর পবিত্র জীবদ্দশায় এমন সব কঠিন সমস্যা ও মাসআলার তিনি সম্মুখীন হয়েছিলেন, যা তাঁর সমসাময়িক বড় বড় জ্ঞানীরা পর্যন্ত সমাধান দিতে অক্ষমতা প্রকাশ করেছিলেন। এমন সব ফতোয়ার সংখ্যা অনেক। এর মধ্যে কয়েকটি ফতোয়ার উল্লেখ করা হলো:

একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি ইমাম সুফয়ান ইবনে সাযীদ ইবনে মাসরুফ আস-সওরী রহমতুল্লাহু আলায়হি (৯৭-১৬১ হি. = ৭১৬-৭৭৮ খ্রি.) ও কাজী আবু লায়লা রহমতুল্লাহু আলায়হি সহ এক বৈঠকে বসা ছিলেন। এমন সময় জনৈক লোক একটি মাসআলা পেশ করলেন যে, কয়েকজন লোক এক স্থানে বসা ছিল, হঠাৎ একটি সর্প এক ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সে ভীত হয়ে সাপটিকে ছুঁড়ে মারলে তা দ্বিতীয় ব্যক্তির গায়ে পড়লো। সেও প্রথম ব্যক্তির মতো লাফ মারলে সাপ তৃতীয় ব্যক্তির ওপর পড়লো। তৃতীয় ব্যক্তিও দ্বিতীয় ব্যক্তির মতো লাফ মারলো, চতুর্থ ব্যক্তি গায়ে পড়লো। সাপটি চতুর্থ ব্যক্তির গায়ে পড়ে তাকে দংশন করলো। তৎক্ষণাৎ সে মারা গেল। এখন প্রশ্ন হলো চতুর্থ মৃত ব্যক্তির দিয়ত (মৃত্যুপণ)-কে আদায় করবে?

বিভিন্নজন নানা উত্তর প্রদান করলেন। কোনটাই সন্তোষজনক না হওয়ায় গৃহীত হলো না। অবশেষে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি বললেন, দেখুন! প্রথম ব্যক্তি থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তির ওপর সাপটা পড়াতে সে অপরাধী হল। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তি লাফ মেরে আত্মরক্ষা করতে সাপটি তৃতীয় ব্যক্তির ওপর পড়লো। সুতরাং প্রথম ব্যক্তি অপরাধ মুক্ত হয়ে গেলো। এভাবে অন্যান্য ব্যক্তিরও নিরপরাধ। তবে শেষ ব্যক্তির ব্যাপারে দুটি কথা। যদি সাপটি ছুঁড়ে মারার সাথে সাথে সাপে কামড়ায় এবং সে ব্যক্তি মারা যায় তাহলে শেষ ব্যক্তির ওপর ক্ষতিপূরণ বর্তাবে। আর যদি কিছুক্ষণ পরে কামড়ায়, তাহলে সে ক্ষতিপূরণের দায় হতে রেহাই পাবে। কারণ মৃত ব্যক্তি নিজেকে বাঁচাবার সময় পেয়েও চেষ্টা করেনি। অতএব তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। ইমাম সাহেব রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর এ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা সবাইকে মুগ্ধ করল।<sup>১</sup>

ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, একদিন এক ব্যক্তি রাগতস্বরে তালাকের শপথ করে আপন স্ত্রীকে বলল যে, আমি ওই সময় পর্যন্ত তোমার সাথে কথা বলবো না যতক্ষণ পর্যন্ত তুমি আমার

<sup>১</sup> সাদেক শিবলী জামান, *ইমাম আবু হানিফা*, ঢাকা, বাংলাদেশ, পৃ. ৯৮

সাথে কথা না বলবে। উত্তরে স্ত্রীও শপথ করে বলল যে, আমিও আপনার সাথে ওই সময় পর্যন্ত কথা বলবো না, যতক্ষণ আপনি আমার সাথে কথা না বলবেন। তখনকার আলিমগণ ফতোয়া দিলেন যে, তাদের মধ্যে যেই কথা বলুক শপথ ভঙ্গ হবে এবং তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর নিকট এ সমস্যার সমাধান চাওয়া হলে তিনি বললেন, যাও গিয়ে আপন স্ত্রীর সাথে কথা বলো। এতে অসুবিধা নেই। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর এ ফতোয়া শুনে হযরত সুফ্ফান আস-সাওরী রহমতুল্লাহু আলায়হ বললেন, জনাব! আপনি হারামকে হালাল করলেন কি করে? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ এবার ব্যাখ্যা দিতে আরম্ভ করলেন, বললেন, স্বামী শপথ করেছিল যে, সে স্ত্রীর কথা বলার পূর্বে কথা বলবে না। এটা শ্রবণে তার স্ত্রীও এভাবে শপথ করলেন। আর যখন শপথ করলেন এতে স্ত্রী আপন স্বামীর সাথে কথা বলেই শপথ করলেন। আর যখন স্বামী তার সাথে কথা বলবে তখন এ কথা স্ত্রীর পরেই হবে। কেননা স্ত্রী শপথ করে এর পূর্বে প্রথমেই কথা বলে ফেলল। আর যখন স্ত্রী কথা বলবে তখন ওই কথা স্বামীর কথার পরে হবে। সুতরাং তাদের উভয়ের মধ্যে শপথ ভঙ্গ হলো না। এটা শ্রবণে ইমাম সুফ্ফান আস-সাওরী রহমতুল্লাহু আলায়হ নিরুত্তর হয়ে গেলেন।<sup>১</sup>

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর এলাকায় এক শিয়া বাস করত। সে হযরত ওসমান রহমতুল্লাহু আলায়হ-কে ইহুদী বলতো। তার একজন বিয়ের যোগ্য কন্যা ছিল। তাঁর জন্য সে পাত্র খুঁজছিল। একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ তাকে গিয়ে বললেন, তুমি নাকি তোমার মেয়ের জন্য পাত্র খুঁজছো? একটি ভালো ছেলে পাওয়া গেছে, ছেলেটি যেমন শরীফ খান্দানী, তেমনি সম্পদশালী। সাথে সাথে সে অত্যন্ত পরহেযগার, হাফেযে কুরআন। শিয়া লোকটি বললো, তাহলে এই ছেলেটি ঠিক করে দিন। এমন সৎপাত্র কোথায় পাওয়া যাবে? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ বললেন, কিন্তু ভাই একটি কথা, ধর্মে সে ইহুদী। একথা শুনে শিয়া লোকটি খুব রাগান্বিত হলো। বললো, কী আশ্চর্য! এত বড় একজন ইমাম হয়ে একজন ইহুদীর সাথে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে বলেছেন? ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ বললেন, তাতে কি? স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো ইহুদীর কাছে নিজ কন্যা বিয়ে দিয়েছেন, তাও আবার একজন নয়, একে একে দু'জন। তিনি যদি তা করতে পারেন তবে তোমার আপত্তি কিসের? আল্লাহর কী অপার রহমত! এতটুকু কথায় শিয়া লোকটির চেতনা ফিরে আসলো। সে তওবা করে স্বস্তির নিশ্বাস ত্যাগ করলো।

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৩

একদিন ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর নিকট জনৈক শত্রু এসে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে ফতোয়া জিজ্ঞাসা করলো, যে বেহেশতের আশা ও দোযখের ভয় রাখে না এবং আল্লাহকেও ভয় করে না, মৃত ভক্ষণ করে, রুকু-সিজদা ছাড়া নামায পড়ে, না দেখে সাক্ষী দেয়, সত্য পছন্দ করে না, ফিতনা ভালোবাসে, রহমত থেকে পালায়, ইহুদী-নাসারাকে সত্যায়িত করে, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনার ফতোয়া বা রায় কী? অতঃপর ইমাম আযম রহমতুল্লাহি তাঁর শিষ্যদেরকে সম্বোধন করে বললেন, এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কী? তাঁরা উত্তরে বললেন, সে অত্যন্ত খারাপ লোক, কারণ এ ধরনের আচরণ কাফিরদের মধ্যেই থাকে। এটা শুনে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি হেসে বললেন, ঠিক নয়। বরং সে ব্যক্তি আল্লাহর বন্ধু ও প্রকৃত মুমিন, এতে সবাই আর্ষান্বিত হলো। আর ইমাম আযম রহমতুল্লাহি সেই প্রশ্নকারী ব্যক্তিকে বললেন, আচ্ছা, আমি যদি এর সঠিক উত্তর দিই, তুমি আমার দুর্নাম করা থেকে বিরত থাকবে কী? সে বলল, হ্যাঁ হুযুর, আমি ওয়াদা করলাম। তখন ইমাম আযম রহমতুল্লাহি উত্তর বলতে আরম্ভ করলেন,

১. লোকটি বেহেশতের আশা রাখে না, সে বেহেশতের মালিকের আশা রাখে।
২. দোযখের ভয় রাখে না, কিন্তু দোযখের মালিককে ভয় করে।
৩. আল্লাহকে ভয় করে না মানে আল্লাহ তাঁর প্রতি জুলুম করবেনা বলে ভয় রাখে না।
৪. মৃত খায় অর্থাৎ সে মাছ খায়।
৫. রুকু-সিজদা ছাড়া নামায পড়ে মানে সে জানাযার নামায পড়ে।
৬. না দেখে সাক্ষী দেয় মানে সে আল্লাহকে না দেখে সাক্ষী দেয়।
৭. সত্যকে পছন্দ করে না মানে সে ব্যক্তি মৃত্যুকে পছন্দ করে না, কারণ সে জীবিত থাকলে আল্লাহর খুব বেশি ইবাদত ও আনুগত্য করতে পারবে।
৮. ফিতনাকে ভালোবাসে মানে সে সম্পদ এবং সন্তানকে ভালোবাসে, যেহেতু আল্লাহ তাআলা কুরআন সম্পদ ও সন্তানকে ফিতনা বলেছেন।
৯. আল্লাহর রহমত হতে পালায় মানে বৃষ্টি থেকে পালায়।
১০. ইহুদী ও নাসারাকে সত্যায়িত করে অর্থাৎ তাদের কথা কুরআনের ভাষায়:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ كَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ كَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ ۖ ۝

‘ইহুদীরা বলে নাসারা কোন ধর্মের ওপর নেই এবং নাসারারা বলে ইহুদীরা কোন ধর্মের ওপর নেই।’<sup>১</sup>

লোকটি এ কথার প্রতি সত্যায়িত করে। এ সঠিক উত্তর শুনে প্রশ্নকারী শত্রু লোকটি তখনই দাঁড়িয়ে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর মস্তক চুম্বনপূর্বক শপথ করে বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আপনি নিশ্চয় সত্যের ওপর আছেন।<sup>২</sup>

এতে বোঝা যায়, আল্লাহ তাআলা ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি-কে এতো ধর্মীয় জ্ঞান দান করেছেন যে, বড় কঠিন মাসআলা যা কেউ বলতে পারে না, তিনি এক মুহূর্তের মধ্যে তা বলে দিতেন। এতে আরও প্রমাণিত হলো যে, তাঁর ধর্মীয় জ্ঞানের কথা শত্রুরাও মেনে নিত।

## স্বভাব-চরিত্র

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি জ্ঞান-গরিমায় যেমন যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তেমনি উত্তম স্বভাব-চরিত্রের দিক দিয়েও ছিলেন অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব। এ ক্ষেত্রে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি খলীফা হারুনুর রশীদ ইবনে মুহাম্মদ আল-মাহদী ইবনুল মানসুর আল-আব্বাসী (১৪৯-১৯৩ হি. = ৭৬৬-৮০৯ খ্রি.)-এর দরবারে আপন উস্তাদের সম্পর্কে যে বর্ণনা দিয়েছেন তা উল্লেখ্যযোগ্য। একদিন খলীফা হারুনুর রশীদ ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর চরিত্র বর্ণনা করতে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহু আলায়হি-কে অনুরোধ করলেন। তখন তিনি বললেন, আমার সম্মানিত উস্তাদ ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি অত্যন্ত আল্লাহভীরু ছিলেন। নিষিদ্ধ বস্তু থেকে মুক্ত থাকতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থেকে চিন্তা করতেন। যদি কেউ কোন মাসআলা জিজ্ঞাসা করত যদি তিনি তা জানতেন তবে উত্তর দিতেন। নতুবা চুপ থাকতেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। কারো নিকট নিজের কোন প্রয়োজনীয়তার কথা বলতেন না। দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তিদের থেকে দূরে থাকতেন। দুনিয়ার জাঁকজমক ও ইজ্জত-সম্মানকে তুচ্ছ মনে করতেন। গীবত থেকে মুক্ত থাকতেন, কারো আলোচনা হলে তার উত্তম দিকগুলো বর্ণনা করতেন। সম্পদের মতো ইলম বিতরণ করতেও খুব আগ্রহী ছিলেন। খলীফা হারুনুর রশীদ এ সমস্ত কথা শুনে বললেন, নেককার ও উত্তম লোকদের এ চরিত্র হয়ে থাকে। আর আপন কেরানীকে তা লিখে রাখতে বললেন এবং আপন

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারা, ২:১১৩

<sup>২</sup> ইবনে হাজার আল-হায়তামী, আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান, পৃ. ৫৫

সন্তানকে তা স্মরণ রাখতে বললেন।<sup>১</sup>

ইমাম আবু ইউসুফ রাহিমাতুল্লাহি আরো বললেন, ইমাম আযম রাহিমাতুল্লাহি যদি কাউকে কোন কিছু দান করতেন আর গ্রহীতা এতে তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলে তিনি দুঃখভরে বলতেন, কৃতজ্ঞতার একমাত্র হকদার আল্লাহই। যার দেয়া সম্পদ আমি তোমাকে দিয়েছি, এতে আমার কি বিশেষত্ব থাকতে পারে? তিনি আরও বলেন, ইমাম আযম রাহিমাতুল্লাহি পুরো বছর আমার পরিবার-পরিজনের ভরণপোষণ নিজেই বহন করতেন। একদিন আমি বললাম, হুযুর! আপনার মতো দানশীল লোক আমি দেখিনি। এতে তিনি বললেন, তুমি আমার উস্তাদ হাম্মাদকে দেখনি, অন্যথায় এমন কথা কখনো বলতেন না।<sup>২</sup>

একদিন ইমাম আযম রাহিমাতুল্লাহি বাজারে যাচ্ছিলেন। তাঁকে দেখে এক ব্যক্তি লুকিয়ে গেলো। তিনি ওই ব্যক্তিকে ডেকে লুকিয়ে যাওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করলে, লোকটি বললো, হুযুর! আপনার কাঁছ থেকে দশ হাজার দিরহাম কর্জ নিয়েছিলাম, অভাবের কারণে তা আজও পরিশোধ করতে পারিনি বিধায় লজ্জায় লুকিয়ে পড়েছি। তার কথায় ইমাম আযম রাহিমাতুল্লাহি-এর অন্তরে অত্যন্ত দয়ার উদ্বেক হলো যে, তার সমুদয় ধারকৃত টাকা মাফ করে দেন।

ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে ওমর ইবনুল হাসান আল-হুসাইন আর-রাযী রাহিমাতুল্লাহি (৫৪৪-৬০৬ হি. = ১১৫০-১২১০ খ্রি.) লিখেছেন যে, একদিন ইমাম আযম রাহিমাতুল্লাহি কোথায় যাচ্ছিলেন, রাস্তা ছিল কাদায় পরিপূর্ণ। পশ্চিমধ্যে তাঁর পদাঘাতে রাস্তার কাঁদা এক ব্যক্তির ঘরের দেয়ালে গিয়ে লাগলো। এতে তিনি ভাবলেন যে, যদি কাঁদা তুলে নিয়ে দেয়াল পরিস্কার করা হয় দেয়ালের মাটি ক্ষয় হবে আর যদি এমনিভাবে ছেড়েও দেয়া হয় তবে এক ব্যক্তির দেয়াল আবর্জনা করার সমতুল্য। এখন কি করা যায়, এ চিন্তায় তিনি মগ্ন। এমন সময় ঘরের মালিক বেরিয়ে আসলো। ঘটনাক্রমে লোকটি ছিল ইহুদী আর হুযুরের কর্জগ্রস্থ। হুযুরকে দেখে সে ভাবলো হয়তো হুযুর টাকা দাবি করতে এসেছেন। ফলে সে হুযুরের নিকট কাকুতি-মিনতি করতে লাগলো। এতে হুযুর বললেন যে, কর্জের কথা ছেড়ে দাও, আমি তো চিন্তা করছি তোমার দেয়াল কি করে পরিস্কার করতে পারি। কাঁদা পরিস্কার করলে তোমার দেয়ালের ক্ষতি হয় আর না করলে

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৪

<sup>২</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৫



অপরিস্কার থেকে যায়। ইমাম সাহব রাহিমুল্লাহ-এর এ কথা শুনে ইহুদী বলে উঠলো হুয়ুর! দেয়াল পরে পরিস্কার করা যাবে, প্রথমে কলেমা পড়িয়ে আমার অন্তর পরিস্কার করে দিন।<sup>১</sup>

একদিন ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ-এর নিকট জনৈক মহিলা মূল্যবান একটি রেশমী শাড়ি বিক্রয়ের জন্য আনেন, ইমাম সাহেব রাহিমুল্লাহ মূল্য জিজ্ঞাসা করলে মহিলাটি বলল, ১০০ দিরহাম। প্রকৃত মূল্য স্ত্রী লোকটির জানা ছিল না। অথচ ইমাম আযম তাকে বললেন, এ কাপড়ের মূল্য তা অপেক্ষা অনেক বেশি। মহিলাটি বলল, তাহলে আমাকে দু'শত দিরহাম দিন। ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ বললেন, আমি এর মূল্য পাঁচশত দিরহাম দেব। একথা শুনে মহিলাটি বলল, আপনি আমার সাথে উপহাস করছেন বুঝি? ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ বললেন, উপহাস নয়। অতঃপর ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ এটা পাঁচশত দিরহাম অর্থাৎ উচিত মূল্য দিয়ে ক্রয় করলেন।

ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ বসরা দেশীয় একব্যক্তির সাথে অংশীদারে ব্যবসা করতেন। একদিন ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ সত্তরটি কাপড়ের তান তাঁর বন্ধুর নিকট পাঠালেন এবং সাথে চিঠির দ্বারা একথাও বলে দিলেন যে, অমুক কাপড় কিছু ক্রুটি রয়েছে, তুমি বিক্রয়কালে ক্রেতাকে এটা অবহিত করিয়ে দেবে, যাতে ক্রেতার ক্ষতি না হয়। কিন্তু বিক্রয়কালে সেই অংশীদার বন্ধু ক্রেতাকে কাপড়ের ক্রুটির কথা বলতে ভুলে যায় ত্রিশ হাজার দিরহাম দিয়ে উক্ত কাপড় বিক্রি করে দেন। এ কথা জানতে পেরে ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ সেই ত্রিশ হাজার দিরহাম আল্লাহর রাস্তায় দান করে দেন।<sup>২</sup>

এভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য, আচার-ব্যবহার, লেনদেন সর্বত্র ইমাম আযম রাহিমুল্লাহ অত্যন্ত আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। ইমাম মক্কী ইবনে ইবরাহীম রাহিমুল্লাহ বলেন যে, আমি কুফাবাসীর মধ্যে ইমাম আবু হানীফা রাহিমুল্লাহ-এর চেয়ে অন্য কাউকে অধিক আল্লাহভীরু ও ন্যায়পরায়ণ দেখিনি। আল্লাহভীতির মধ্যে তিনি ছিলেন এক অদ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য সমুজ্জ্বল। হারাম বস্তু থেকে এটুকু পরিমাণ বিরত থাকতেন যে, কোন কোন সময় সন্দেহের কারণে তিনি অনেক হালাল সম্পদকেও পরিত্যাগ করতেন। তাঁর তাকওয়ার পরিপূর্ণতার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তিনি কখনো কোন খলীফা বা রাষ্ট্রীয় প্রতিনিধির উপটোকন গ্রহণ করতেন না।<sup>৩</sup>

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৬

<sup>২</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৭

<sup>৩</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৭

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ তাঁর যুগের একজন শ্রেষ্ঠ সম্পদশালী লোক হওয়া সত্ত্বেও খুব সাদাসিধা ও অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তিনি নিজেই বলেছেন, আমার মাসিক খোরাকী দু'দিরহামের বেশি নয়। কখনো ছাত্তু আর কখনো রুটি আমার খাদ্য। ভোগ-বিলাসের জন্য নয় বরং আল্লাহর সৃষ্টি জীবের উপকার ও আত্মসম্মান রক্ষার মানসেই তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন। আমীর-ওমরাদের প্রতি হাত প্রসারিত করতে হবে বলে আমার ভয় হতো, তবে আমি আমার কাছে এক দিরহামও রাখতাম না।<sup>১</sup>

বন্ধু-বান্ধব ও সাক্ষাতকারীদের জন্য তিনি কিছু দৈনিক খরচ বরাদ্দ রাখতেন। ওলামা ও মুহাদ্দিসের জন্য তাঁর ব্যবসায়ের কিছু অংশ নির্দিষ্ট ছিল। যার মুনাফা বছরান্তে তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হতো। গরীব ছাত্রদের দায়িত্ব তিনি নিজেই গ্রহণ করতেন এবং অভাবী মনে হলে খুব বদান্যতার সাথে তার অভাব মোচন করতেন।<sup>২</sup>

## ইবাদত ও রিয়াযত

আল্লামা শামসুদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে ওসমান আয-যাহাবী রহমতুল্লাহু আলায়হ (৬৭৩-৭৪৮ হি. = ১২৭৪-১৩৪৮ খ্রি.) বলেন, ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর নিয়মিত তাহাজ্জুদ আদায় করা ও পুরো রাত ইবাদতে নিয়োজিত থাকার ঘটনা বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণিত। তিনি রাতে আল্লাহভীতিতে এতো বেশি ক্রন্দন করতেন যে, তাঁর প্রতিবেশীরা পর্যন্ত তাঁর প্রতি দয়াপরবশ হয়ে পড়তো।

হযরত ফযল ইবনে ওয়াকীল রহমতুল্লাহু আলায়হ বলেন, আমি তাবেঈদের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর ন্যায় এতো খোদাভীতি নিয়ে নামায পড়তে আর কাউকে দেখিনি। প্রার্থনাকালে আল্লাহর ভয়ে তাঁর চেহারার রং বিবর্ণ হয়ে যেত। পবিত্র রমযানে দিবারাত্রি এক খতম কুরআন আদায় করতেন। ৩০ বছর পর্যন্ত সারা রাত ইবাদতে অতিবাহিত করেছেন। প্রতি রাকাতাতে এক খতম কুরআন শরীফ আদায় করেছেন। উপরন্তু তিনি একাধারে দীর্ঘ ৪০ বছর ইশার অযু দিয়ে ফজর নামায আদায় করেছেন।<sup>৩</sup>

সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হ-এর অভিমত হলো, একমাত্র আল্লাহ তাআলাই সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী। আল্লাহ তাআলার প্রতিভূ হিসেবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ অপরিহার্য এবং কুরআন ও

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৭

<sup>২</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৭

<sup>৩</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৫৭

সুন্নাহর বিধানসমূহ চিরন্তন ও চূড়ান্ত হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। খিলাফত সম্পর্কে তাঁর অভিমত সুস্পষ্ট। বিজ্ঞজনের (আহলুর রায়ের) সঙ্গে পরামর্শ ও জনগণের স্বাধীন সম্মতিক্রমে খলীফা নির্বাচিত হবেন। শক্তি বলে ক্ষমতা দখল করে পরবর্তীতে জবরদস্তী করে জনগণের সম্মতি আদায় করাকে তিনি অবৈধ ও অনৈসলামিক পন্থা বলে ঘোষণা করেছেন। খলীফা মনসুর আল-মুন্তাসির বিল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ আয-যাহির বি-আমরিব্বাহ ইবনুন নাসির আল-আব্বাসী (৫৮৮-৬৪০ হি. = ১১৯২-১২৪২ খ্রি.)-এর সম্মুখে জীবনের ঝুঁকি নিয়েও তাঁর খিলাফত সম্পর্কে তিনি নিঃসংকোচে এ রূপ অভিমত ব্যক্ত করেন।

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলিয়াহি-এর মতে, পদ মর্যাদার দিক হতে প্রধান বিচারপতির স্থান রাষ্ট্রপ্রধানের অব্যবহিত পরেই; রাষ্ট্রপ্রধান বিচারপতিকে বিশেষ বিশেষ কারণে অপসারণ করতে পারেন, কিন্তু বিচারপতি স্বীয় পদে সমাসীন থাকাকালে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং স্বতন্ত্র। বিচারকের রায় রাষ্ট্রপ্রধান মেনে চলতে বাধ্য। খলীফা যদি জনগণের অধিকার খর্ব করে, তবে খলীফার আদালতের রায় মেনে নিতে বাধ্য করার মতো শক্তি এবং সামর্থ্য বিচারপতির থাকতে হবে। কিন্তু উমাইয়া ও আব্বাসীয়া শাসনামলে বিচারপতির এরূপ স্বাধীনতা ছিলনা বলেই ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলিয়াহি আব্বাসীয়দের অধীনে প্রধান বিচারপতির পদ গ্রহণে এগিয়ে যাননি। তিনি প্রয়োজনে চাবুকাঘাত সহ্য করলেন তবুও ইসলামী আদালতকে অবমাননা করেননি।

উমাইয়া শাসনের পতনের পর আব্বাসীয়া শাসকগণ উমাইয়া বংশীয়দেরকে নির্বিচারে হত্যা করতে থাকেন। ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলিয়াহি এ হত্যায়ত্তের তীব্র প্রতিবাদ করেন। আব্বাসী খলীফা মনুসর ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলিয়াহি-কে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে আব্বাসীয় সালতানাতের পক্ষে কাজে লাগাতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি বিভিন্ন অজুহাতে সেই পদ প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবে ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলিয়াহি-কে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাঁকে কয়েদখানায় বন্দী করে চাবুকাঘাতে জর্জরিত করা হয়। কয়েদখানায় তাঁকে দিনের পর দিন কোন খাদ্য এবং পানীয় না দিয়ে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখা হতো। পিপাসায় জর্জরিত করে জনগণের অলক্ষ্যে ক্রমশ তাঁকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়া হয়। অবশেষে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করে তাঁকে হত্যা করা হয়। তবুও সত্য ও ন্যায়ের শার্দুল ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলিয়াহি ক্ষণিকের জন্য অন্যায় ও অসত্যের কাছে

মাথা নত করেননি। সত্য ও ন্যায়ের ঝাঙকে চির সমুন্নত করে রেখে গেছেন। তাঁর এ আত্মত্যাগ ও নির্ভিকতা যুগে যুগে সত্যের সৈনিকদেরকে অত্যাচারী শাসক ও শোষকদের সামনে সত্যকথা বলতে ও অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যোগাবে।<sup>১</sup>

## রচনাবলি

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর যুগে গ্রন্থ রচনা ও লিপিবদ্ধকরণের তেমন প্রচলন গড়ে উঠেনি। সাধারণত লোকেরা মুখস্ত করতে অভ্যস্ত ছিল। শিক্ষকের বক্তব্য নোট করে রাখা হত। এ জন্য ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলাইহ-এর রচনাবলির সংখ্যা তেমন বেশি দেখা যায় না। তবুও তাঁর কতিপয় রচনাবলি সুধী সমাজে বেশ সমাদৃত। যেমন—

১. كِتَابُ التَّعْلِيمِ وَالْمُعْتَمَلِ: এটা আকাঈদ ও উপদেশাবলি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন আর শিক্ষকের জবাব পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হয়।
২. كِتَابُ الْوَصَايَا: বিভিন্ন সময়ে তাঁর কয়েকজন শিষ্যকে যে উপদেশ দেন তা ‘আল-ওয়াসায়্যাহ’ নামে পরিচিত। ‘কিতাবুল ওয়াসায়্যাহ’-তে তাঁর উক্ত সব উপদেশমালা সংকলন করা হয়েছে।
৩. الْإِئْتِقَادُ الْإِسْلَامِيُّ: এটা ইসলামী আকীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে লিখিত সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ। পরবর্তী আলিমগণ এটার বিভিন্ন ভাষ্য রচনা করেন। আল্লামা মোল্লা আলী সুলতান ইবনে মুহাম্মদ আল-কারী (১০০০-১০১৪ হি. = ১০০০-১৬০৫ খ্রি.) রচিত ভাষ্যটি সমধিক প্রসিদ্ধ। মিসর ও অন্যান্য দেশে এটা বহুবার মুদ্রিত হয়েছে।
৪. رِسَالَةُ الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَى عُثْمَانَ النَّبِيِّ: (উসমান আল-বাত্তীকে লিখিত চিঠি) এ চিঠিতে তিনি মার্জিতভাবে তাঁর বিরুদ্ধে প্রচারিত অভিযোগসমূহ খণ্ডন করেছেন।
৫. مُسْنَدُ أَبِي حَنِيفَةَ: তিনি যে সকল হাদীসের ব্যবহার ও ব্যাখ্যা করেছেন, তার শাগরিদ ও পরবর্তী হানাফী ফকীগণ এগুলোর বিভিন্ন সংকলন প্রস্তুত করেন। এ সকল সংকলন ‘মুসনাদু আবী হানীফা’ নামে পরিচিত।
৬. কাসীদাতুন নুমান: যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রশংসায় লিখিত কাসীদা।<sup>২</sup>

<sup>১</sup> শামসুল আলম, ইসলামী রাষ্ট্র, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৯৫৫), পৃ. ৫৭

<sup>২</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬১-৩৬২

## ইমাম আযম রহমতুল্লাহি عليه السلام ও ইলমে ফিকহ

তিনি সমগ্র মুসলিম জাহানের এক অবিস্মরণীয় ও সম্মানিত নাম।  
দীনে ইসলাম তথা শরীয়তে মুহাম্মদী ﷺ-এর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক।  
যাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে প্রিয় নবী ﷺ তাঁর বাণীতে ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন।  
যেমন—

«لَوْ كَانَ الْإِنْيَانُ عِنْدَ الثَّرِيَّا لَتَنَاولَهُ رِجَالٌ مِّنْ فَارِسَ».

‘দীন ইসলাম যদি সুরাইয়্যা নক্ষত্রের নিকটেও চলে যায়, তবে  
পারস্যের কিছু সংখ্যক লোক ওখান থেকে দীন (ইসলাম)-কে  
অর্জন করবে।’<sup>১</sup>

হাদীস বিশারদগণ তাকেই প্রিয় নবী ﷺ-এর এ গৌরবান্বিত  
সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। গৌরবান্বিত সুসংবাদের সাথে সম্পৃক্ত  
করণের দু’টি কারণ ব্যক্ত করেন।

প্রথমত উক্ত হাদীসে প্রিয় নবী ﷺ ‘দীনে ইসলাম’ সুরাইয়্যা  
নক্ষত্রের নিকট চলে যাওয়া দ্বারা একথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, অনেক  
অনৈসলামিক মতবাদ ইসলাম ধর্মে অনুপ্রবেশ করত মানুষ দীন ইসলামের  
সঠিক ও স্বচ্ছ আদর্শ, নীতি থেকে দূরে অবস্থান করবে। তাই আমরা  
ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাব যে, তিনি এমন এক দুর্দিনে  
সত্যের মশাল নিয়ে আবির্ভূত হন, যখন বহুজাতি ও দেশের তাহযীব-  
তামদুনের সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের সংমিশ্রণের ফলে বহু নতুন  
সমস্যা দেখা দিয়েছিল। তা ছাড়া মুসলিম সাম্রাজ্যের মধ্যে গ্রিক দর্শনের  
বহুল প্রসারের ফলে ইসলামী চিন্তাধারায় অনেক তর্ক-বিতর্ক হতে লাগল  
এবং ইসলামের চিন্তা-চেতনায় অনেক অনৈসলামিক মতবাদ অনুপ্রবেশ  
ঘটেছিল। ইসলামের এমন দুর্দিনে তাঁর আবির্ভাব সত্যিই প্রিয় নবী ﷺ-এর  
উপরোক্ত বাণীর বাস্তবতা।

দ্বিতীয়ত নবী করীম ﷺ এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তি পারস্য দেশীয় হবে  
বলে স্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করেছেন। এদিক দিয়েও তিনি প্রিয় নবী ﷺ কর্তৃক  
সংবাদপ্রাপ্ত প্রারম্ভিক যুগে স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্র হিসেবে ফিকাহশাস্ত্রের বিকাশ  
বরং তা কুরআন ও সুন্নাহর মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়েছিল। কোন সমস্যা

<sup>১</sup> আস-সুয়ুতী, আল-ফতহুল কবীর ফী যাম্মিয় যিয়াদ ইলাল জামিউস সগীর, দারুল ফিকর, বয়রুত,  
লেবনান (১৪২৩ হি. = ২০০৩ খ্রি.), খ. ৩, পৃ. ৪২, হাদীস: ১০০৫২—হযরত আবু হুরায়রা রাঃ-  
বর্ণিত

দেখা দিলে ছয়রপাক <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup> থেকে সাহাবায়ে কেরামগণ জিজ্ঞেস করে সমাধান করে নিতেন। নবী করীম <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup>, খোলাফায়ে রাশেদীন ও শীর্ষস্থানীয় সাহাবাগণের যুগে ইলমে ফিকহ-এর প্রয়োজনীয়তাও তেমন অনুভব হয়নি। উমাইয়া শাসনামল থেকে যখন ইসলামী সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং অনারব জাতির সংমিশ্রণে ইসলামে নিত্য নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে শুরু করে, তখন এ সকল উদ্ভূত নবতর সমস্যার সমাধান সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকার দরুন সমাজের ন্যায্য-নীতি বিঘ্নিত হওয়ার মারাত্মক আশংকা সৃষ্টি হয়। এভাবে দিন দিন বিভিন্ন বাতিল মতবাদ ফিতনা-ফ্যাসাদ বেড়ে যাওয়ায় সময়ের প্রয়োজনীয়তা এবং যুগের চাহিদা মারফিক ইমাম আযম <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup>, তাঁর ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup> ও ইমাম মুহাম্মদ <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup> সহ একটি দল গঠন করে ইলমে ফিকহের উসূলুল কাওয়ানীন বা ফিকহের নীতিমালার বিভিন্ন ধারা-উপধারা প্রণয়নে এগিয়ে আসেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে উক্ত নীতিমালা ও কায়দাসমূহের ওপর ভিত্তি করে পরবর্তী ইমাম ও মুজতাহিদ ফিকহশাস্ত্রের বিভিন্ন কিতাব রচনা করেন। তাই তিনি ইলম ফিকহ-এর প্রথম স্থপতি ও প্রবর্তনকারী হিসেবে বিশ্বের দরবারে খ্যাতি অর্জন করেন। আর এজন্য তাঁকে ‘ইমাম আযম’ তথা ইমামকুলের শিরোমণি রূপে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং ফিকহশাস্ত্র বাদ দিলে যেমন মুসলিম বিশ্বের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না; তদ্রূপ ইমাম আযমকে বাদ দিয়ে ফিকহশাস্ত্রের অস্তিত্বও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এক কথায় বলতে গেলে, ফিকহশাস্ত্রের অপর নাম আবু হানাফী আবু আবু হানীফার দ্বিতীয় নাম ইলমে ফিকহ।<sup>১</sup>

ইলমে ফিকহ বা ইসলামী আইনশাস্ত্রে ইমাম আযম <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup>-এর অবদান ইমামগণের ওপর কতটুকু ছিল তা তাঁদের বাণী থেকে সহজে জানতে পারি। নিম্নে এ সম্পর্কে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অংশ তুলে ধরা হলো। ইমাম আযম সম্পর্কে ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইদরীস ইবনুল আব্বাস ইবনে ওসমান আশ-শাফেয়ী <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup> (১৫০-২০৪ হি. = ৭৬৭-৮২০ খ্রি.) যথার্থ বলেছেন, ‘সকল মানুষ (ইমাম মুজতাহিদ সবাই) ফিকহশাস্ত্রে ইমাম আবু হানীফা <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup>-এর সন্তানস্বরূপ।’

ইমাম শাফেয়ী <sup>আবদুল হক আল-আলমী</sup> আরও বলেছেন, ‘যদি কোন ব্যক্তি ইলমে ফিকহের মধ্যে ব্যাপক জ্ঞান অর্জন করতে চায়, সে যেন ইমাম আযম আবু

<sup>১</sup> আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, বাংলাদেশ (১৪০৮ হি. = ১৯৮৮ খ্রি.), পৃ. ৪৪

হানীফা <sup>আলায়াহি</sup> এবং তাঁর শিষ্যগণের সান্নিধ্য অবশ্যই গ্রহণ করে।’

একদিন ইমাম শাফেয়ী <sup>আলায়াহি</sup> তাঁর উস্তাদ ইমাম মালেক <sup>আলায়াহি</sup>-কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি কি ইমাম আযম আবু হানীফা <sup>আলায়াহি</sup>-কে দেখেছেন? এর জবাবে ইমাম মালেক ইবনে আনাস ইবনে মালিক আল-আসবাহী <sup>আলায়াহি</sup> (৯৩-১৭৯ হি. = ৭১২-৭৯৫ খ্রি.) বলেন, ‘হ্যাঁ! আমি এমন এক ব্যক্তিকে দেখেছি, যদি তিনি তোমার সাথে এ স্তম্ভের ব্যাপারে একে স্বর্ণ বলে দাবি করেন, তবে তিনি যুক্তি তর্কে বিজয়ী হবেন।’

ইমাম মালেক <sup>আলায়াহি</sup>-এর উক্তি দ্বারা ইমাম আযম <sup>আলায়াহি</sup>-এর অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হওয়ার কথা সহজে অনুমেয়।

ইমাম আযম <sup>আলায়াহি</sup> সম্পর্কে ইমাম ইয়াহইয়া ইবনে মুঈন ইবনে আওন ইবনে যিয়াদ <sup>আলায়াহি</sup> (১৫৮-২৩৩ হি. = ৭৭৫-৮৪৮ খ্রি.) বলেন, ‘ইমাম আযম আবু হানীফা <sup>আলায়াহি</sup>-এর ফিকহই আসল ফিকহ।’

ইমাম জুরজানী <sup>আলায়াহি</sup> বলেছেন, যদি হযরত মুসা <sup>আলায়াহি</sup> ও হযরত ঈসা <sup>আলায়াহি</sup>-এর উম্মতের মধ্যে ইমাম আযম আবু হানীফা <sup>আলায়াহি</sup>-এর মতো একজন জ্ঞানী থাকতেন, তবে তারা কখনো ইহুদী এবং নাসারা হতো না। অবশ্যই হক ও ন্যায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকত।’

ইমাম আলা উদ্দিন মুহাম্মদ আলী ইবনে মুহাম্মদ আল-হিসনী আল-খাসকফী <sup>আলায়াহি</sup> (১০২৫-১০৮৮ হি. = ১৬১৬-১৬৭৭) আদ-দুররুল মুখতারের ভূমিকায় ইমাম আযম <sup>আলায়াহি</sup> সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার পর বলেন, ‘এ আলোচনার সার কথা হল যে, ইমাম আযম আবু হানীফা <sup>আলায়াহি</sup> পবিত্র কুরআনের পরে রাসূলে পাক <sup>আলায়াহি</sup>-এর অন্যতম মহান মুজিয়া স্বরূপ।’<sup>১</sup>

এমন কি এটাও বর্ণিত আছে যে, হযরত ঈসা <sup>আলায়াহি</sup> ও হযরত মাহদী <sup>আলায়াহি</sup> উভয়েই ইমাম আযম আবু হানীফা <sup>আলায়াহি</sup>-এর মাযহাব অনুযায়ী বিধি-বিধান জারি করবেন।’

যা হোক, ইমাম আযম <sup>আলায়াহি</sup>-এর ফযীলত এবং জ্ঞানের ব্যাপকতা বিধি-বিধান দুনিয়ার ইমাম ও মুজতাহিদগণ মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন।

<sup>১</sup> আল-হাসকফী, আদ-দুররুল মুখতার শরহ তানওয়ীকুল আবসার ওয়া জামিউল বিহার, দারুল ফিকর, বয়রুত, লেবনান (১৪১২ হি. = ১৯৯২ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৩

<sup>২</sup> আল-হাসকফী, প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬

<sup>৩</sup> আবুল হাসান যায়দ আল-ফারুকী, সাওয়ানেখ-ই-ইমাম আযম, দিল্লি, ভারত (১৪১১ হি. = ১৯৯১ খ্রি.), খ. ১, পৃ. ৫৫-৫৬

ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ইবনে ওয়াযিহ আল-হানযলী রহমতুল্লাহি আলায়হি (১১৮-১৮১ হি. = ৭৩৬-৭৯৭ খ্রি.)-এর মতে, কুরআন ও হাদীসের আলোকে ইসলামী আইনশাস্ত্রের বিকাশে ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি যে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন, উক্ত শাস্ত্রের পাঠকদেরকে তা সর্বদাই স্বরণ করিয়ে দেয়। কোন কোন মুহাদ্দিস তাঁর মাযহাবকে ব্যক্তিগত মত (রায়) ভিত্তিক বলে অমূলক ধারণা পোষণ করেন। অথচ *কিতাবুস সিয়ানা* গ্রন্থের বর্ণনা অনুযায়ী ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর সংকলিত মাসআলার সংখ্যা বার লক্ষ নব্বই হাজারের উপরে। ইসলামী জীবনধারার বিভিন্ন দিক-ইবাদত, ব্যবসা-বাণিজ্য, কুটির শিল্প, রাজস্ব, বিচার-ব্যবস্থা, শাসন-পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত এক বিপুল সংখ্যক প্রশ্নের সমাধানে তাঁর অভিমতের মূল সূত্র কুরআন ও সুন্নাহ। ইসলামী আইন সংকলনের ব্যাপারে তিনি যে পন্থা ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, তা ছিল খুবই ব্যাপক এবং দুরূহ। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর সাত শতাধিক শাগরিদদের মধ্য হতে চল্লিশজনের সমন্বয়ে একটি আইন পরিষদ গঠন করেন, যাদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম যুফর রহমতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল হাসান রহমতুল্লাহি আলায়হি, ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে মুবারকের ন্যায় প্রসঙ্গি মুহাদ্দিস, ফকীহ ও আইনবিদ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতের সাথে তাঁর শাগরিদদের মতামত সূক্ষ্মভাবে যাচাই করে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এভাবে ইসলামী আইনচর্চা একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে এবং তাঁর নেতৃত্বে ত্রিশ বছর যাবত ইসলামী শরীয়া আইনের সামগ্রিকভাবে বিধিবদ্ধকরণ এর কার্য অব্যাহত থাকে। তাঁর জীবদ্দশায়ই তাঁর প্রস্তুত ফাতোয়াসমূহ সাথে সাথেই সর্বমহলে প্রচারিত হয়ে যেতো। এভাবে তাঁর নেতৃত্বে সংকলিত ইসলামী শরীয়া আইন মুসলিম জগতের অধিকাংশ দেশে রাষ্ট্রীয় বিধিরূপে পরিগৃহীত হয়।<sup>১</sup>

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর শাগরিদদের মধ্যে ইমাম আবু ইউসুফ রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর *ইখতিলাফু আবী হানীফা ওয়া ইবনে আবী লায়লা*, আর-রাঈ আল্লা সিয়ারিল আওয়াঈ এবং *কিতাবুল খারাজ* আর ইমাম মুহাম্মদ আশ-শায়বানী রহমতুল্লাহি আলায়হি রচিত *আল-মাবসুত*, *আল-জামিউস সাগীর*, *আল-জামিউল কবীর*, *আস-সিয়ারুল কবীর*, *আস-সিয়ারুস সাগীর* ও অন্যান্য গ্রন্থ ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি আলায়হি-এর আইন সংক্রান্ত চিন্তধারার উল্লেখযোগ্য

<sup>১</sup> (ক) আবু সাঈদ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ, *ফিকহ শাস্ত্রের ক্রমবিকাশ*, ইফাবা, পৃ. ৪৪

(খ) সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬০



মৌলিক উৎস। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর অনুসারীদের জীবনী ও কর্মতৎপরতা পর্যালোচনা করলে ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-কে সহজেই অনুমান করা যায়। সামগ্রিক বিচারে ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহু আলায়হি ফিকহী চিন্তা-ভাবনা তৎকালীন কুফার অন্যান্য ফকীহদের চিন্তা-ভাবনা হতে অনেক উন্নত ছিল। তিনি আইনের উৎস নির্ধারণ ও আইন প্রণয়নের সমসায়িক ধরণ-পদ্ধতির তাত্ত্বিক সংস্কারে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিলেন এবং ইসলামী আইনের প্রয়োগিক বিধি-বিধানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধন করেছিলেন।<sup>১</sup>

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি সরকারি কোন পদে অধিষ্ঠিত না থাকার কারণে তাঁর চিন্তা-ভাবনা সকল রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রভাব হতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল। তাঁর আইন সংক্রান্ত চিন্তাধারা কুরআন সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসে চতুর্বিদ দলীলের ব্যাপক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং প্রয়োগিক বিচার বিশ্লেষণে তা অধিকতর পূর্ণাঙ্গ ছিল সর্বোপরি তা ছিল অধিকতর বাস্তবানুগ ও কল্যাণকর। সমসাময়িককালের অন্যান্য ফকীহ ফিকহী বিষয়াদিতে রায় ও কিয়াসকে যতটুকু স্থান দিয়েছেন, তিনিও ততটুকুই গুরুত্ব দিতেন এবং খবর-ই-আহাদের ভিত্তিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সময়কাল হতে নিরবিচ্ছিন্নভাবে মুসলিম সমাজের প্রচলিত কোন আকীদা পরিহারের পক্ষপাতী ছিলেন না।

ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর অবিস্মরণীয় অবদান হলো, তিনি ইসলামী আইনের চারটি মৌলিক সূত্র নির্ধারণ করেন, কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াস। এ ছাড়া তিনি ইসতিহসানকেও পঞ্চম সূত্র হিসেবে গণ্য করেন। কুরআনের ব্যাখ্যায় তিনি শাস্তিক ব্যাখ্যার অনুসারী খারেজি সম্প্রদায় এবং নিছক যুক্তিবাদের অনুসারী মুতাযিলা সম্প্রদায়ের তুলনায় একটি মধ্যমপন্থা অবলম্বন করেন। কুরআনের মুহকাম আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে নির্ধারিত মৌলিক নীতির আলোকে এবং প্রামাণ্য হাদীসের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি অত্যধিক সাবধানতা অবলম্বন করেন। পরস্পর বিরোধী হাদীসের ক্ষেত্রে যেই হাদীসটির মর্ম সর্বদিক দিয়ে যুক্তি-সংগত বিবেচিত হত তিনি সেইটি গ্রহণ করতেন। বিরোধী বা বিতর্কিত সকল হাদীস পরিত্যাগ করে তিনি নতুন কোন অভিমত গ্রহণ করতেন না। সাহাবীদের মতভেদের ক্ষেত্রেও তিনি এই নীতি অবলম্বন করতেন। এটার কারণ সম্পর্কে তিনি বলতেন, স্পষ্টভাবে উল্লেখ না থাকলেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট হতে সাহাবীরা এটা শুনবার সম্ভাবনা রয়েছে। এ সব ক্ষেত্রে তিনি সকল ব্যক্তিগত

<sup>১</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬০

অভিমতের ওপর সাহাবীদের অভিমতের প্রাধান্য দিতেন। কোন কোন ক্ষেত্রে কুরআন-হাদীসের মর্মানুযায়ী বৃহত্তর জনকল্যাণের স্বার্থে কিয়াসে জলী বা সুস্পষ্ট কিয়াসের পরিপন্থী সিদ্ধান্ত গ্রহণকে তিনি অধিক সমীচীন মনে করতেন। এটা উসুলের পরিভাষায় ইসতিহসান বলা হয়।<sup>১</sup>

ইমাম আযম উপরোক্ত নীতি ও পদ্ধতি অবলম্বনে ফিকহশাস্ত্রে গতিময়, যুগোপযোগী এবং যেকোন যুগের যেকোন পরিস্থিতির মুকাবিলা ও সমস্যার সমাধানে উপযোগী অবলম্বনও সূত্র হিসেবে বিকশিত করেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তিনি ফিকহশাস্ত্রে কোন কোন প্রাচীন বিধি-বিধান পরিহার করে তাতে তাঁর নিজস্ব মত সংযোজন করেছেন। খতীব-বাগদাদী রহমতুল্লাহু আলায়হি এসব বিরুদ্ধবাদী দৃষ্টিভঙ্গির ভাষ্যকাররূপে পরিগণিত হন। এরূপ অভিযোগ যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন তা তার নিজস্ব উক্তি, অনুসৃত-নীতি ও পদ্ধতি এবং তাঁর সংকলিত ফিকহ হতেই স্বতঃসিদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়। শরঈ আইন সংক্রান্ত তাঁর প্রত্যেকটি অভিমত ও সিদ্ধান্তের মূল উৎস যে কুরআন ও হাদীস প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহগণ তাঁদের বহুগ্রন্থের বিভিন্ন সূত্রে উদ্ধৃতি সহকারে তা প্রমাণ করেছেন। ইমাম আযম রহমতুল্লাহু আলায়হি-এর সংকলিত ফিকহ মুসলিম বিশ্বের আব্বাসীয় যুগ হতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রচলিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে।

আইন, বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে নীতি ও আদর্শগত মতপার্থক্য জনিত অনৈক্য, বিশৃঙ্খলা ও সংঘাত হতে বৃহত্তর মুসলিম সমাজকে রক্ষার এটার সফলতা অনস্বীকার্য। ফলে বর্তমান বিশ্বে তাঁর প্রবর্তিত ফিকহ ও মাযহাবের অনুসারীর সংখ্যা শতকরা ৭৫ ভাগ। এখানে ফিকহে হানফীর কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো।  
যেমন—

১. হানাফী ফিকহে শরীয়তের সমুদয় মাসাআলাসমূহ তত্ত্ব-তথ্য, হিকমত ও কল্যাণকারিতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন— নামাযের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে আল্লাহর বাণী:

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۖ

‘নামায অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা হতে বিরত রাখে।’<sup>২</sup>

আর রোযার অপরিহার্যতা প্রসঙ্গে বলেন,

<sup>১</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, ইসলামী বিশ্বকোষ, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬১

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-আনকাবুত, ২৯:৪৫

‘এ রোযার মাধ্যমে সম্ভবত তোমরা যাবতীয় পাপকার্য থেকে বেচে থাকবে।’<sup>১</sup>

আর জিহাদের কল্যাণকারিতা সম্পর্কে বলেন,

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ ﴿٧٨﴾

‘যাতে ফিতনা বা বিশৃঙ্খলা অবশিষ্ট না থাকে।’<sup>২</sup>

এ প্রসঙ্গে ইমাম আবু জাফর আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সালামা আত-তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি (২৩৯-৩২১ হি. = ৮৫৩-৯৩৩ খ্রি.) শাফেয়ী মাযহাব ত্যাগপূর্বক হানাফী মাযহাব গ্রহণের ঘটনাও উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন- হানাফী মাযহাবের প্রখ্যাত ফকীহ তাহাবী প্রথমে শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। তাঁর হানাফী মাযহাব গ্রহণের কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, একদিন ইমাম তাহাবী আপন মামা ইমাম মাযানী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর কাছে পড়ছিলেন। তখন অধ্যয়নকালে তাঁর মামা এ মাসআলাটি পড়াচ্ছিলেন যে, যদি কোন গর্ভবতী মহিলা মারা যায় তার পেটে শিশু জীবিত থাকে, ইমাম শাফেয়ী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযহাব মতে মৃত মায়ের পেট কেটে সন্তান বের করা বৈধ নয়। কিন্তু হানাফী মাযহাব মতে এটা বৈধ। ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এ মাসআলা পড়তেই দাঁড়িয়ে গেলেন আর বললেন, আমি ওই ব্যক্তির অনুসরণ করতে পারি না, যে আমার মত মানুষের ধ্বংস হওয়াকে বিন্দুমাত্র পরওয়া করে না। অথবা ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি এভাবে বললেন যে, আমি ঐ ব্যক্তির মাযহাবের ওপর সন্তুষ্ট নয়, যে আমার ধ্বংসের ওপর সন্তুষ্ট। কারণ ইমাম তাহাবী তাঁর মায়ের পেটে থাকা কালে তাঁর সম্মানিত মাতা মৃত্যুবরণ করে আর ইমাম আযম রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর ফতোয়ার ওপর ভিত্তি করে তাঁর মায়ের পেট কেটে তাকে বের করা হয়।

ইমাম তাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলায়হি-এর এ অবস্থা দেখে তাঁর মামা তাকে বললো, আল্লাহর শপথ! তুমি কখনো ফকীহ হবে না। আল্লাহর অশেষ করুণায় তিনি যখন যুগশ্রেষ্ঠ ফকীহ ও মুহাদ্দিস হলেন তখন ইমাম তাহাবী প্রায়সময় বলতেন, আমার মামার ওপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক! যদি তিনি জীবিত থাকতেন তবে অবশ্যই শাফেয়ী মাযহাব অনুযায়ী

<sup>১</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৮৩

<sup>২</sup> আল-কুরআন, সূরা আল-বাকারাহ, ২:১৯৩

স্বীয় শপথের কাফফারা আদায় করতেন। তাই বোঝা যায় ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি-এর মাযহাব মানবীয় স্বভাব প্রকৃতি এবং কল্যাণকারিতার অধিক নিকটবর্তী ছিল। ফলে ইমাম তাহাবী রাহমতুল্লাহি-এর মতো অনেক বিজ্ঞ লোকেরা যুগে যুগে এ মাযহাবকে গ্রহণ করে নেন।<sup>১</sup>

২. হানাফী মাযহাব অন্যান্য মাযহাবের তুলনায় একান্ত সহজ ও অনায়াস সাধ্য।
  ৩. মানুষের পার্থিব প্রয়োজনাতি তথা লেন-দেন ও আচার-আচরণের ক্ষেত্রে তিনি গভীর অন্তঃদৃষ্টি ও তত্ত্ব-উপাত্তের সাথে কাজ করেছেন। আর অন্যান্য ইমামগণ তার বিপরীতে বাহ্যিক নসসমূহ ও কিয়াসে জলীর সাহায্যে মাসআলা উদ্ভাবন করেছেন।
  ৪. হানাফী ফিকহ যিস্মী অমুসলমানদেরকে একান্ত উদার দৃষ্টিভঙ্গির সাথে স্বাধীনভাবে স্বীয় অধিকার ভোগ করার অধিকার সুযোগ দান করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী ও অন্যান্য মাযহাবের ইমামগণ ভিন্ন মতবাদ পোষণ করেছেন। অমুসলমানদের প্রতি হানাফী মাযহাবের এ উদার নীতি দেখে অনেক অমুসলিম ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হানাফী মাযহাবের অনুসারী হয়।
  ৫. যে সমস্ত শরীয়তের বিধি-বিধান নস বা অকাট্য দলীলের মাধ্যমে সাব্যস্ত এবং যাতে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে, সেই সকল মাসআলায় তিনি যে দলীলটি গ্রহণ করেছেন, সাধারণত তা অতি শক্তিশালী ও প্রামাণ্য। যেমন- ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি অযুর মধ্যে ফরয চারটি উল্লেখ করেছেন। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি ও অপরাপর ইমামদের কারো মতে অযুর ফরয ৫টি, ৬টি, ৮টি, নয়টি। এতে ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি-এর দলীল এই যে, কুরআন মাজীদে অযুর আয়াতের মধ্যে চারটি অপেক্ষর উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং অযুর ফরয এ চারটিই গণ্য হবে এবং অবশিষ্ট আহকামগুলো ফরযের অন্তর্ভুক্ত হবে না।
- অনুরূপভাবে ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি-এর মাযহাবানুযায়ী এক তায়াম্মুমদ্বারা একাধিক ফরয, নফল আদায় করা যায়। কিন্তু শাফেয়ী ও ইমাম মালেক এর মতে প্রত্যেক নামাযের জন্য নতুন তায়াম্মুম করা ফরয। এ ক্ষেত্রে ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি-এর দলীল হলো, তায়াম্মুম হল অযুর স্থলাভিষিক্ত ও সমপর্যায়ভুক্ত। সুতরাং অযু ও তায়াম্মুমের হুকুম এক ও অভিন্ন হবে।

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়াক্কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ১৫৫-১৫৬

৬. কুরআন হাদীসের বিধানসমূহকে ফিকহ হানাফীর মধ্যে অত্যন্ত দৃঢ় ও যুক্তিগ্রাহ্য দৃষ্টিকোণ হতে গ্রহণ করা হয়েছে।
৭. তাহযীব-তামাদ্দুনের জন্য যা কিছু অত্যাৱশ্যকীয় অন্যান্য মাযহাবের ফিকহ-এর তুলনায় এতে তা সমধিক। তাই হানাফী ফিকহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে বিভিন্ন লেখকের ফিকহের কিতাব অধ্যয়ন করা আবশ্যিক।<sup>১</sup>

## হানাফী মাযহাব দেশে দেশে

হানাফী মাযহাব ইরাকে জন্ম লাভ করে এবং আব্বাসীয় খলীফা হারুনুর রশীদের রাজত্বকালে এটা সরকারি মাযহাবের মর্যদায় উন্নীত হয়। কালক্রমে এ মাযহাব পূর্ব দিকে প্রসার লাভ করতে থাকে। বিশেষভাবে খুরাসান ও টাঙ্কানিয়াতে। সেখানে এ মাযহাবের অসংখ্য প্রসিদ্ধ ফকীহ ব্যক্তির উদ্ভব ঘটে। বিভূষিত হয়ে বংশানুক্রমিক হানাফী রাষ্ট্রস (প্রধান)-রূপে বুখরায় রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতা পরিচালনা করেন। মরক্কোতে মালিকীদের পাশাপাশি তাদের অনুসারী হিজরী পঞ্চম শতকের পূর্ব পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সিলিতে তারা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। কিন্তু তুরস্কের উসমানী সাম্রাজ্যের ক্রমোন্নতির সাথে সাথে আবার হানাফী মাযহাব নব জীবন লাভ করে। তিউনিসিয়া ও মিসরেও এটা সরকারী স্বীকৃত ও অনুমোদিত মাযহাব। তুর্কী খলীফাদের প্রায় সকলেই হানাফী ছিলেন। বর্তমান তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের অধিকাংশ মুসলিমই হানাফী মাযহাবের অনুসারী।<sup>২</sup>

উল্লেখ্য যে, ভারতীয় উপমহাদেশে মুসলিম শাসনকর্তাগণ প্রধানত হানাফী মাযহাবের ফিকাহকেই তাদের রাষ্ট্রীয় আদালতে প্রয়োগ করেছিলেন। তাই উপমহাদেশে হানাফী ফিকাহ বিষয়ক বেশ কয়খানা বিখ্যাত ফাতওয়াগ্রন্থ রচিত হয়েছে। এর মধ্যে *ফতোয়ায়ে হিনদিয়া* বা *ফতোয়ায়ে আলমগীরী* নামক গ্রন্থখানা সর্বপেক্ষা বিখ্যাত। এ গ্রন্থখানা সম্রাট আওরাঙ্গজেব আলমগীর কর্তৃক গঠিত একটি পরিষদ কর্তৃক রচিত হয়েছিল।<sup>৩</sup>

অতএব হানাফী মাযহাবের ফিকহ ব্যাপক জনগণ কর্তৃক গৃহীত হবার পেছনে আব্বাসীয় খিলাফতের যুগে ইমাম আবু ইউসুফ রাহমতুল্লাহু আলাইহ -এর কর্তৃক প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত হওয়ার অসামান্য অবদান থাকলেও

<sup>১</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬০

<sup>২</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬০

<sup>৩</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬০

হানাফী মাযহাবের বিপুল জনপ্রিয়তার মূল কারণ আল্লামা শিবলী নুমানী রহমতুল্লাহি (১২৭৪-১৩৩২ হি. = ১৮৫৮-১৯১৪ খ্রি.) ভাষায়: ইমাম আযম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি ফিকহ মানবীয় প্রয়োজনসমূহের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল ও উপযোগী প্রমাণিত হয়েছিল, বিশেষত উন্নত তাহযীব-তামাদ্দুন ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির সাথে এফিকহ যত বেশি পরিমাণে সংগতিশীল ছিল, অন্য কোন ফিকহ সেইরূপ সংগতিশীল ছিল না।<sup>১</sup>

## নবীপ্রেম ও ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি

ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর জীবনের প্রতিটি কর্ম নবীপ্রেমে সিদ্ধ ছিল এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন ইসলামের শাস্ত দ্বারা আহলে সুন্নাত আল জামাআতের প্রকৃত মুখপাত্র। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শানে রচিত তাঁর দীর্ঘ কাসীদা এ বাস্তব সত্যের বহিঃপ্রকাশ। তিনি কায়মনোবাক্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধকে আল্লাহপ্রাপ্তির পূর্বশর্ত মনে করতেন। নবীপ্রেমেই ছিল তাঁর জীবনের অমূল্য রত্ন। তাঁর হৃদয় জুড়ে নবীপ্রেম ভরপুর ছিল। শয়নে স্বপনে শুধু প্রিয় প্রেমাস্পদের নামই ছিল তাঁর জপমালা। প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি ইমাম আযম রহমতুল্লাহি-এর এতো গভীর ভালোবাসা ছিল বলেই প্রিয় রাসূলের রওয়া মুবারকে উপস্থিত হয়ে তিনি যখন ‘আস-সালামু আলায়কা ইয়া সাইয়েদাল মুরসালীন’ বলে সালাম আরয করলেন, রওয়া মুবারক হতে উত্তর আসলো, ওয়া আলায়কাস সালাম ইয়া ইমামাল মুসলিমীন।<sup>২</sup>

## ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি-এর কতিপয় বৈশিষ্ট্যাবলি

আল্লাহ তাআলা ইমাম আবু হানীফা রহমতুল্লাহি-কে এমন সব বৈশিষ্ট্য দ্বারা ধন্য করেছেন যা তাঁর যুগের ও পরবর্তী যুগের কোন ইমাম, ফকীহ, মুজতাহিদ ও মুহাদ্দিস কারো ভাগ্যে জুড়েনি। যেমন—

১. তিনি খায়রুল কুররন বা সর্বোত্তম তিন যুগের দ্বিতীয় যুগে জন্মগ্রহণ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, এ যুগের লোক পরবর্তী যুগের লোকদের থেকে উত্তম।
২. তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রহিমতুল্লাহি, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা রহিমতুল্লাহি ও অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম রহিমতুল্লাহি-এর সাক্ষাৎ লাভ করেন। তাই তাবৈঈর মর্যাদা লাভ করেন।

<sup>১</sup> সম্পাদকমণ্ডলী, *ইসলামী বিশ্বকোষ*, ইফাবা, খ. ২, পৃ. ৩৬০

<sup>২</sup> ড. ফজলুর রহমান, *কাসীদা-ই-নুমান* (অনুদিত)

৩. তিনি হযরত আনাস ইবনে মালিক রাঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাঃ-সহ অনেক সম্মানিত সাহাবীদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন।
৪. তাঁর শিক্ষক ও ছাত্রদের সংখ্যা অন্যান্য ইমামদের শিক্ষক ও ছাত্রদের থেকে অনেক বেশি ছিল।
৫. তিনি সর্বপ্রথম ইলমে ফিকহ সংকলন করেন। শরীয়তের বিধি-বিধানকে বিষয়ভিত্তিক অধ্যায়ে সুবিন্যস্ত করে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করেন। অধিকন্তু ইমাম মালেক রাঃ ইমাম আযম রাঃ-এর সংকলিত লিপির অনুসরণ করেই মুআত্তা রচনা করেন।
৬. তাঁর ইজতিহাদের নিয়ম-নীতি থেকেই সমস্ত ইমাম ও মুজতাহিদ সাহায্য গ্রহণ করেন। তাই ইমাম শাফেয়ী রাঃ বলেছেন যে, ‘সমস্ত ফকীহ ইমাম আবু হানীফার বংশধর।’
৭. ইমাম আযম রাঃ-এর মাযহাব পৃথিবীর এমন দেশে বিস্তৃতি লাভ করেছে যেখানে তাঁর মাযহাব ছাড়া অন্যকোন মাযহাব পৌঁছেনি।
৮. মোল্লা আলী কারী রাঃ-এর পরিসংখ্যান মতে সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ লোক হানাফী মাযহাবের অনুসারী। আর বাকী এক-তৃতীয়াংশ লোক অন্যান্য মাযহাবের অনুসারী।
৯. তিনি কখনো কারো থেকে উপটোকন ও প্রতিদান গ্রহণ করেননি, নিজের কষ্টার্জিত সম্পদ দ্বারা নিজেই চলতেন এবং অন্যান্য আলিম, ফকীহ ও মিসকিনের মধ্যেও ব্যয় করতেন।
১০. ইবাদত ও পরহেযগারীতে তিনি যে পরিমাণ চেষ্টা ও সাধনা করতেন ইতিহাসে অন্য কোন ইমামের বেলায় এ ধরনের শ্রম-সাধনার প্রমাণ মিলে না।<sup>১</sup>

## ওফাত

পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আব্বাসী খলীফাদের অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে ইমাম আযম রাঃ প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু সারা আব্বাসীয় সাম্রাজ্য তাঁর প্রভাব প্রতিপত্তির কারণে আব্বাসীয় খলীফা মনসুর তাঁকে প্রকাশ্যে কতল করতে সাহস করেনি। বরং সুলতান মনসুর কোন রূপ তাঁকে শাস্তি না দিয়ে অর্থ ও পদমর্যাদার লোভ দেখিয়ে সালতানাতের ইজ্জত বৃদ্ধি করতে চেয়েছিলেন এবং সর্বশেষে তাঁকে প্রধান

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৬৬

বিচারপতির পদ গ্রহণ করতে চাপ দিতে থাকেন। কিন্তু তিনি এ কূটকৌশল প্রথমেই আঁচ করতে পেরে ছিলেন। তাই বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে তিনি ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করেন।

তাকে আব্বাসীয় সালতানাতের স্বার্থে ব্যবহার করতে ব্যর্থ হলে সুলতান মনসুর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। তাকে জেলখানায় বন্দি করে চাবুকাঘাতে জর্জরিত করা হয়। ১৫০ হি. = ৭৬৭ খ্রি. সালে বন্দী অবস্থায় বাগদাদে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর প্রথম জানাযায় পঞ্চাশ হাজার লোকের সমাগমন হয়। দাফন করার পরও বিশদিন পর্যন্ত তাঁর কবরের ওপর লোকেরা জানায পড়তে থাকে। বাগদাদের খেরযান নামক কবরস্থানের পূর্ব পার্শ্বে মসজিদ সংলগ্ন তাঁর মাযার রয়েছে। মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চল হতে বহু লোক প্রতিদিনই এ মাযার যিয়ারতে আসেন।<sup>১</sup>

ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি কোন সমস্যায় পড়লে মিসর থেকে ইরাকে ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর কবর যিয়ারতে উপস্থিত হতেন এবং দু'রাকাত নামায পড়ে তাঁর উসিলা নিয়ে দুআ করতেন। আল্লাহর রহমতে অতি তাড়াতাড়ি তাঁর প্রার্থনা কবুল হতো এবং অভাব মোচন হতো। ইমাম শাফেয়ী রাহমতুল্লাহি আলায়হি আরও বলেন, ‘আমি যখন ইমাম আবু হানীফা রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর মাযার যিয়ারতে যেতাম, আমার নিজস্ব ইজতিহাদ ছেড়ে দিয়ে ইমাম আযম রাহমতুল্লাহি আলায়হি-এর ইজতিহাদের ওপর আমল করতাম। কারণ তাঁর রওজায় এসে তার বিরুদ্ধ মতের ওপর আমল করাটা আমার লজ্জাবোধ মনে হতো। তাই ইমামের পেছনে সূরা আল-ফাতিহা ও ফজরের নামাযের রুকুতে কুনুত পড়া ছেড়ে দিতাম।<sup>২</sup>

আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উসিলায় এ মহান ইমামের মত, পথ ও আদর্শের ওপর আমল করার তাওফীক দিন। আমিন।

আমি আল্লাহর প্রিয়জনদের ভালোবাসি। যদিও আমি নেক্কার নই। কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রত্যাশী যে, আল্লাহর প্রিয়জনদের মহাব্বত করার কারণে যেন আমাকেও নেক্কারদের অন্তর্ভুক্ত করবেন।

<sup>১</sup> গোলাম রাসুল সাঈদী, *তায়কিরাতুল মুহাদ্দিসীন* (১৯৭৭), পৃ. ৬৬

<sup>২</sup> ইবনে হাজার আল-হায়তামী, *আল-হায়রাতুল হাসান ফী মানাকিব আবী হানীফা আন-নুমান*, পৃ. ৬